আমরা যাহা বিশ্বাস করি

রেজাউল করীম

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নবজীবন সংঘ

৫ এ, অন্নদা নিয়োগী লেন,

কলিকাতা

নবজীবন সংঘ
৫।এ, অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা
হইতে
শ্রীইলা চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

দোল-পূর্ণিমা, ১৩৪৮

প্রিণ্টার শ্রীআশুতোষ ভড
শক্তি প্রেস
২৭।৩ বি হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য চার আনা

আমরা যাহা বিশ্বাস করি

শুধু বেঁচে থাকাব জন্য বেঁচে থাকা—সে হচ্ছে পশুব ধর্ম্ম। মানুষের ধর্ম্ম আলাদা। মানুষ কেবল বেঁচে থাকতে চায়না—সে চায় একটা-কিছুব জন্য বাঁচ্‌তে। তাব জীবন চায় এমন একটা আদর্শ যাব জন্য সে সহস্র জন্ম হাসিমুখে উৎসর্গ কবতে পাবে।

যত আদর্শ আছে তাব মধ্যে, বোধ হয, প্রেমেব আদর্শই মানুষেব চিত্তকে নাড়া দিয়েছে সব চেযে বেশী ক'বে। 'যুক্ত কবো হে সবাব সঙ্গে মুক্ত কবো হে বন্ধ'—যুগে যুগে এই প্রার্থনাই মানুষেব কণ্ঠ থেকে উৎসাবিত হযেছে। কেন ? কাবণ মানুষ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বাবম্বাব দেখেছে, ছোটো ছোটো বাসনাব গণ্ডীর মধ্যে আপনাব সত্তাকে বন্দী ক'বে বাখায দুঃখ ছাড়া আব কিছু নেই। সুখ বহু মানবেব মধ্যে আপনাকে ব্যাপ্ত ক'বে দেওয়ায়, আনন্দ সকলেব মধ্যে আপনাকে নিঃশেষে হাবিয়ে ফেলায। মানুষ যেখানে আপনাকে ভুলতে পেরেছে কোনো বৃহৎ আদর্শের ডাকে সেখানে সে কাবাগার থেকে মুক্তি পেয়েছে।

যে মানুষ সকলের মধ্যে আপনার চেতনাকে ব্যাপ্ত ক'বে দিতে পেবেছে, প্রেমে যে মানুষ সকলের সঙ্গে যুক্ত হবাব সৌভাগ্য লাভ করেছে তাব প্রাণ দেবালয়েব নির্জ্জন কোণে বৈকুণ্ঠের রাস্তাকে অন্বেষণ ক'রে তৃপ্তি পায়নি, সাহিত্যেব মর্ম্মর-মীনাবে সুন্দরেব পূজাতেও মগ্ন থাকতে পাবেনি। মাতৃকোলে যেখানে যত শিশু কেঁদেছে ক্ষুধাব দুঃসহ যাতনায়

তাদের সকলের কান্না তার মর্মে করেছে প্রবেশ—লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিত মানুষের দুঃখকে তার নিজের দুঃখ ব'লে মনে হয়েছে। কোটী কোটী মানুষ যদি আজীবন জীবন্ত নরকঙ্কাল হ'য়ে থাকে—স্বর্গে তাহ'লে কি প্রয়োজন? মুক্তিতেই বা কি লাভ? মানুষের জ্ঞানের রাজ্যকে প্রসারিত করবারই বা কি সার্থকতা? সহস্র সহস্র মানুষ যদি অন্ন না পেলো, জ্ঞান না পেলো, সংস্কৃতি থেকে, আনন্দ থেকে আজীবন বঞ্চিত হ'য়ে রইলো—তবে দিগন্তব্যাপী এই দুঃখের মধ্যে হৃদয়বান মানুষ কি সুখে বাঁচতে চাইবে? এই যে ভালোবাসার গভীর অনুভূতি—এই অনুভূতিই মানুষকে যুগে যুগে অনুপ্রাণিত করেছে মানুষের সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করতে। ভালোবেসেই বিবেকানন্দ বললেন, "বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?" ভালোবেসেই বল্ট্যা লিখলেন,

If any man would see the living god face to face, he must seek him, not in the empty firmament of his own brain, but in the love of men

ভগবানকে যে চোখের সামনে মূর্ত্ত দেখতে চায় সে তাকে কোথায় খুঁজবে?

> নয়কো বনে, নয় বিজনে,
> নয়কো আমার আপন মনে,
> সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
> সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।

মানুষের ভালোবাসার মধ্যে ভগবানকে যে পেলোনা—সে তাকে কোথাও পাবে না।

ভালোবেসেই রবীন্দ্রনাথ গাইলেন,

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সবহারাদের মাঝে।"

বড়ো বড়ো কলকারখানা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা, সেই সব অট্টালিকায় বহুবিধ উপকরণের প্রাচুর্য, প্রশস্ত প্রশস্ত রাজপথ, সুন্দর সুন্দর বন্দর, ইস্কুল আর কলেজ, টেলিফোন আর টেলিগ্রাফ, রেলগাড়ী আর ইষ্টিমার, নানা রকমের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—সভ্যতার এই বিচিত্র উপাদানগুলি বঙ্কিমের চিত্তকে যে উল্লসিত করতে পারেনি—তারও কারণ দেশের লক্ষ লক্ষ সর্ব্বহারা কৃষককে তিনি ভালোবেসেছিলেন।

তাদের কথা ভেবেই দেশকে তিনি প্রশ্ন করলেন,

"এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটী কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল? হাসিম সেখ, আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে খালিপায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটী অস্থিচর্ম্ম বিশিষ্ট বলদে ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে। উহাদের মঙ্গল হইয়াছে?"

দেশের কোটী কোটী নিরন্ন হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্তের মধ্যে বঙ্কিমের চেতনা ব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল ব'লেই রেলগাড়ী আর টেলিগ্রাফ, হাসপাতাল আর ছাপাখানা, দূরবীণ আর গ্যাসের আলো, পাহারাওয়ালা আর নাগরিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠি দিয়ে—দেশের কতখানি মঙ্গল হয়েছে—তার বিচার তিনি করলেন না। তিনি বললেন,

"—আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিবনা। দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন

থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষীজীবী। ......
যেখানে তাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।"

ঈশ্বরে প্রীতি ভিন্ন দেশপ্রীতিই যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম—কেবল এই কথা শিখিয়েই বঙ্কিম ক্ষান্ত থাকেন নি। হাসিম শেখ এবং রামা কৈবর্ত্তের কঙ্কালসার মূর্ত্তিতে গ্রামে গ্রামে যে কোটী কোটী হিন্দু ও মুসলমান বংশপরম্পরায় নিরন্নের অভিশপ্ত জীবন বহন ক'রে চলেছে তাহারাই যে দেশ এবং তাহাদেরই মঙ্গল যে দেশের মঙ্গল—এই মহাসত্যও বঙ্কিম আমাদের শেখালেন। বঙ্কিম শেখালেন, লোকহিত পরিত্যাগ ক'রে তিথিতত্ত্ব মলমাসতত্ত্ব প্রভৃতি আটাশ তত্ত্বের কচ্‌কচিতে ধর্ম্ম নয়, যদ্দ্বারা লোকরক্ষা বা লোকহিত সাধিত হয় তারই নাম ধর্ম্ম।

মানুষের প্রতি অপরিমেয় প্রেমই তো গান্ধীকে টেনে এনেছে রাজনীতির মধ্যে। যে দেশে কোটী কোটী মানুষ অনশনে দিন যাপন করে সেই দুর্ভাগা দেশে কর্ম্মকে বাদ দিয়ে ধর্ম্ম প্রচারের নির্ব্বুদ্ধিতা স্বামীজীর মতোই অতি সহজে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। দরিদ্রনারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে গান্ধী দেখ্‌লেন, সর্ব্বাগ্রে কোটী কোটী মানুষের জন্য চাই অন্ন আর সেই অন্নের জন্য চাই রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা। দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে কার্ল মার্ক্স লণ্ডন সহরে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহে যে ব্রতী থাকতে পেরেছিলেন, দৈন্যের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে আজীবন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা তাঁর পক্ষে যে সম্ভব হয়েছিলো—এরও পিছনে ছিলো প্রেমেরই প্রেরণা। ভালো না বাসলে কি মানুষ মানুষের জন্য এত দুঃখকে বরণ ক'রে নিতে পারে? লেনিন এবং তাঁর সহকর্ম্মীর দল বিপ্লবের কণ্টকাকীর্ণ পথে যে আজীবন চল্‌তে পেরেছিলেন, কোনো দুঃখ, কোনো কষ্ট যে তাঁদের সংকল্পকে

বিচলিত করতে পারেনি—সেও প্রেমেরই জোরে। যারা জোরের সঙ্গে ভালোবাসতে পারে তারাই তো জোরের সঙ্গে ভাঙতে পারে। গোর্কি লেনিন সম্পর্কে লিখেছেন,

A splendid human being, who had to sacrifice himself to hostility and hatred, so that love might be at last realised

সর্ব্বব্যাপী প্রেমের আদর্শকে জয়যুক্ত করবার জন্যই ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে লেনিনের নিষ্ঠুর অভিযান। সেদিনের শয়তানী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জনসাধারণের জীবন সর্ব্বত্র কি রকম পঙ্গু হ'য়ে ছিলো— সে দৃশ্য দেখে তাঁরা স্থির থাকতে পারেন নি। পৃথিবীর কোটী কোটী মানুষের অভিশপ্ত জীবনে আনন্দ আনবার জন্যই বিপ্লবের বিঘ্নবহুল পথে তাঁরা যাত্রা করেছিলেন। আর ক্রোপট্‌কিন? তিনিও যে ঐশ্বর্য্যের ভিতর থেকে নেমে এলেন পথের ধূলায় বিপ্লবের অগ্রদূত হ'য়ে—সেও কি প্রেমেরই জন্য নয়? চোখের সামনে নিরাশ্রয় নারী শিশু কোলে নিয়ে শীতের রাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায় রাস্তায়, শত শত পরিবার কেবলমাত্র শুকনো রুটী খেয়ে দিনের পর দিন নিরন্নের অভিশপ্ত জীবন বহন ক'রে চলেছে, না খেতে পেয়ে কত নর, কত নারী, কত শিশু শুকিয়ে শুকিয়ে অবশেষে মৃত্যুর বুকে ঢ'লে পড়ছে—এ রকম দৃশ্য আর কতদিন দেখা যায়? যে সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের জীবনে এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা তাকে পরিবর্ত্তন করবার জন্যই ক্রোপট্‌কিন এবং তাঁর সহচরগণ বিপ্লবের পথকে বরণ ক'রে নিলেন। ক্রোপট্‌কিন লিখলেন, It is to put an end to these iniquities that we rebel

বঙ্কিমচন্দ্র বিবিধ প্রবন্ধে গৌরদাসবাবাজীর মুখ দিয়ে বৈষ্ণবের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করতে গিয়ে লিখেছেন—"যে খৃষ্টান কি মুসলমান মনুষ্যমাত্রকে আপনার মত দেখিতে শিখিয়াছে, সে যীশুরই পূজা করুক আর পীর

প্যায়গম্বরেরই পূজা করুক, সেই পরম বৈষ্ণব।" বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ভালোবাসবার অসীম ক্ষমতাকেই বৈষ্ণবের বৈশিষ্ট্য ব'লে ঘোষণা করেছেন। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের আর এক লক্ষণের কথা বলেছেন। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলছেন—"প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার।" গৌরদাস বাবাজী এবং সত্যানন্দ বৈষ্ণব ধর্ম্মের দুটো বিভিন্ন দিকের কথা বলেছেন—একজন বলেছেন মানুষকে ভালোবাসার কথা, আর একজন দুষ্টকে দমন করবার কথা। বৈষ্ণবের এই যে দুটো বৈশিষ্ট্য—আসলে এদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। যে মানুষকে ভালোবাসে সে-ই দুষ্টকে দমন করতে অগ্রসর হয়। উৎপীড়িতের হাহাকার তার চিত্তকে বিচলিত করে এবং সেই জন্য অন্যায়কারীকে বাধা না দিয়ে সে থাকতে পারে না। মানুষকে যে ভালোবাসেনা চোখের সামনে অন্যায় দেখেও সে উদাসীন থাকে। আসল বৈষ্ণব তো সেই একদিকে যে পুষ্পের মতো কোমল এবং আর একদিকে বজ্রসম কঠিন। মার্ক্স আর লেনিন, তিলক আর গান্ধী, ক্রোপট্‌কিন আর জওহরলাল—জগতের লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত্ত নরনারীর প্রতি অপরিমেয় সমবেদনাই এঁদের সবাইকে বিপ্লবের পথে টেনে এনেছে। ওয়েব্ (Webb) দম্পতী তাঁদের বিখ্যাত গ্রন্থ "Soviet Communism"এ ঠিকই লিখেছেন,—

'What moved Karl Marx to a lifetime of political conspiracy and economic study in grinding poverty—what steeled the will to revolution of Lenin and his companions—was the misery and incompleteness of life that contemporary economic conditions every where inflicted on the mass of the populalion"

"সমসাময়িক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জনসাধারণের জীবনকে দারিদ্র্যের মধ্যে পঙ্গু ক'রে রেখেছিলো। তাদের সেই অভিশপ্ত জীবনের দুঃখ কার্ল মার্ক্সকে দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যেও

আজীবন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং অর্থনীতির গবেষণায় ব্রতী থাকতে প্রেরণা দিয়েছিলো, লেনিন এবং তাঁর সহচরগণের বিপ্লব সৃষ্টির সংকল্পকে দৃঢ়তা দান করেছিলো।"

জীবনের সায়াহ্নে চিত্ত যখন স্বভাবতই শান্ত আবেষ্টনীর মধ্যে বিশ্রাম কামনা করে তখনও যে গান্ধী সত্যাগ্রহ পরিচালিত করবার দায়িত্বকে স্বীকার ক'রে নিলেন—হাতে পাঞ্চজন্য তুলে নিতে অস্বীকার করলেন না—সেও তো প্রেমেরই ডাকে। স্বাধীনতা চাই ভারতবর্ষের কোটী কোটী মানুষকে মানুষের মতো বাঁচবার যে সৌভাগ্য তার অধিকারী করবার জন্য। তাদের বাদ দিয়ে বেঁচে থাকবার কি কোনো প্রয়োজন আছে? গান্ধী বললেন,

"আমার সত্বার প্রতি অণু-পরমাণুতে আমি জনসাধারণেরই একজন। তাদের বাদ দিলে আমার কিছুই থাকে না। তাদের অস্বীকার ক'রে আমি বেঁচে থাকতে চাইনে।"

এই যে সর্ব্বব্যাপী প্রেম—এর চেয়ে বিশালতর আর কোনো বড়ো আদর্শের কল্পনা কি আমরা করতে পারি? সক্রেটিসই বলি আর খৃষ্টই বলি, রামকৃষ্ণই বলি আর বিবেকানন্দই বলি, বুদ্ধই বলি আর চৈতন্যই বলি, লেনিনই বলি আর গান্ধীই বলি—সকলেরই বাণীর মর্ম্ম হ'চ্ছে প্রেম—মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম, সম্প্রদায়ের প্রতি সম্প্রদায়ের প্রেম, জাতির প্রতি জাতির প্রেম। আমরা চারণেরা এই প্রেমের আদর্শকেই জীবনের আদর্শ ব'লে গ্রহণ করেছি এবং সেই জন্যই শ্রেণীহীন সমাজের জ্যোতির্ম্ময় আদর্শ আমাদের অন্তরে সর্ব্বোচ্চ আদর্শ ব'লে প্রতিভাত হয়েছে। এই শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা সাম্যের ভিত্তির উপরে। সেই আদর্শ-সমাজে মগজের দ্বারাই হোক আর হাতের দ্বারাই হোক, সমাজ-সেবার দায়িত্বই হবে প্রত্যেকটী নাগরিকের প্রধান দায়িত্ব। শিশু, রুগ্ন অথবা বৃদ্ধ ছাড়া কর্ম্ম সবাইকেই করতে হবে। আমি সমাজে

আছি—শুধু এই কারণেই তো সমাজ আমাকে বাচিয়ে রাখবার দায়িত্ব নিতে পারে না। I must pay my way by what I do সমাজের সেবার জন্য কাজ সে করবেনা সেই নিষ্কর্মার অপদার্থ জীবনকে সবাই কৃপার চোখে দেখবে। গান্ধীজীর পরিকল্পিত স্বরাজেও—

Every body contributes his or her due quota to the common goal

সমষ্টির কল্যাণের বেদীমূলে প্রত্যেকের যা দেবার আছে তা উৎসর্গ করতে হবে।

চরকার গুঞ্জনের মধ্যে তো কম্যুনিজমেরই জয়গান। শ্রেণীহীন সমাজে একজন মানুষ আর একজন মানুষকে লাভের জন্য যন্ত্ররূপে ব্যবহার করতে পারবে না—কোনো শ্রমিকও উদরান্নের জন্য তার দক্ষিণ হস্তকে অন্যের কাছে, যত অল্প পারিশ্রমিকেই হোক বিক্রয় করতে বাধ্য হবে না। শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শ বর্ণনা করতে গিয়ে ওয়েব-দম্পতী সোভিয়েট কমিউনিজমের (Soviet Communism) দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন,

"The aim was an equalitarian society where health and economic security, education and culture, manners and refinement would be, in the absence of any privileged class, or any privileged race, substantially common to all, because effectively open to all Nothing less than this creation of a new and unprecedented social order is the Bolshevist aim' P 1020

"উদ্দেশ্য ছিলো সাম্যে প্রতিষ্ঠিত এমন একটা সমাজ গঠন করা যেখানে স্বাস্থ্য এবং সম্পদ, শিক্ষা এবং সংস্কৃতি, শালীনতা এবং ভব্যতা—এসবের মোটামুটি অধিকারী হবে সবাই, কারণ সেই সমাজে এসকলের পথ সবার কাছেই উন্মুক্ত থাকবে, সুবিধাভোগী শ্রেণী বা সম্প্রদায় ব'লে কিছু থাকবে না। এই যে অভিনব এবং অপূর্ব্ব সমাজ ব্যবস্থা—একে সৃষ্টি করাই হচ্ছে বলশেভিকদের লক্ষ্য।"

গান্ধীজীর স্বরাজেও দেখতে পাচ্ছি,

—all can read and write, and their knowledge keeps growing from day to day. Sickness and disease are reduced to the minimum No one is pauper and labour can always find employment It should not happen that a handful of rich people should live in jewelled palaces and millions in miserable hovels devoid of sunlight or ventilation "

মার্ক্সের শ্রেণীহীন সমাজ আর গান্ধীর স্বরাজ—দু'য়েরই আদর্শ হচ্ছে সার্ব্বজনীন কল্যাণের আদর্শ—প্রত্যেকটী মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের আদর্শ। শ্রেণীহীন সমাজে অথবা স্বরাজে অসুস্থ অথবা অশিক্ষিত লোক থাকবেনা বল্‌লেই চলে। স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য এবং জ্ঞানের সম্পদ সকলেরই অধিকারের মধ্যে আসবে। সেখানে বেকার-সমস্যা ব'লে কোনো সমস্যাই থাকবে না, মুষ্টিমেয় ধনীর অট্টালিকার পাশে লক্ষ লক্ষ মানুষ আলোহীন বায়ুশূন্য স্যাঁত্‌সেতে ঘরে বাস করছে—এমন দৃশ্য কারও চোখে পড়বে না। 'মনোপলি'র উপরে মার্ক্সের যেমন ঘৃণা গান্ধীরও তেমনি ঘৃণা। গান্ধী বলেন,

"I hate privilege and monopoly. Whatever cannot be shared with the masses is taboo to me "

"সবাইকে বঞ্চিত ক'রে সব সুবিধাভোগকে নিজের জন্য একচেটিয়া ক'রে রাখাকে আমি ঘৃণা করি। সবার সঙ্গে ভাগে যা ভোগ করা সম্ভব নয় আমার কাছে তা বর্জ্জনীয়।"

স্বরাজের আর শ্রেণীহীন সমাজের ভিত্তি তা'হলে প্রেমে। তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নন্‌ভায়োলেন্স—প্রেম।

'The world of to-morrow as I see it will be, must be, a society based on non-violence That is the first law, for it is out of that law that all other blessings will follow " —Gandhi

"ভাবী জগত আমার কাছে যে রূপ নিয়ে প্রতিভাত হচ্ছে সেখানে সমাজের ভিত্তি হবে প্রেমে। এই প্রেমই হচ্ছে সেখানকার মূল নীতি—কারণ এই প্রেমকে আশ্রয় করেই আর সব কল্যাণের আবির্ভাব হবে।" গান্ধী

শ্রেণীহীন সমাজে জোরের প্রতীক রাষ্ট্র আপনার অস্তিত্বকে বিলুপ্ত ক'রে ফেলেছে। সেখানে নাগরিকগণকে দমন করবার জন্য পুলিশের রেগুলেশন লাঠির আর কোনো প্রয়োজন নেই—কারণ যে শুভবুদ্ধি জাগ্রত হ'লে মানুষ সমাজের মঙ্গলকে আঘাত করা তো দূরের কথা—তাকে পুষ্ট করবার জন্য অনুপ্রাণিত হয় সেই শুভবুদ্ধির আলোকে শ্রেণীহীন সমাজের লোকেরা আপনাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে অভ্যস্ত হয়েছে। মানুষ যেখানে আপনার অন্তরের আলোয় কল্যাণের পথে চলবার সৌভাগ্য লাভ করেছে—সেখানে লগুড়ধারী পুলিশের আর তো কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না। নৈতিক অপরাধ অবশ্য কিছু কিছু ঘটবেই কিন্তু তার প্রতীকারের জন্য এখন যে সব নিষ্ঠুর পন্থা অবলম্বিত হয়, শ্রেণীহীন সমাজে সে সব পন্থা বর্ব্বরতা ব'লে পরিত্যক্ত হবে। আমরা জানি গান্ধীজীর পরিকল্পিত স্বরাজেও সৈনিকের সঙ্গীনের কোনো স্থান নেই। পুলিশ থাকবে কিন্তু তার কাজ হবে দমন করা নয়—নতুন মানব-সমাজ গ'ড়ে তোলায় সাহায্য করা। পুলিশ হবে রিফর্ম্মার অর্থাৎ সমাজ-সংস্কারক। আমরা মার্ক্সের পরিকল্পিত শ্রেণী-হীন সমাজের আদর্শের সঙ্গে গান্ধীজীর পরিকল্পিত স্বরাজের আদর্শের বিশেষ কোনো তফাৎ দেখি না। আমরা স্বাধীন ভারতবর্ষকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই সাম্যের ভিত্তিতে। ভোট পর্য্যন্ত এসে সেখানে গণতন্ত্রের দৌড় ফুরিয়ে যায় নি, রাজনৈতিক গণতন্ত্র সেখানে অর্থ-নৈতিক গণতন্ত্রের মধ্যে বৃহত্তর পরিণতি লাভ করেছে, জমি, খনি, কলকারখানার উপরে ব্যক্তির অবাধ অধিকারের পরিবর্ত্তে সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

—সুতরাং ধনী আর দরিদ্র ব'লে সেখানে পৃথক পৃথক দুটী শ্রেণী আর নেই। 'শ্রেণীহীন সমাজ' কথাটার মধ্যে সাম্যের অর্থনৈতিক দিকটার স্পষ্টতর অভিব্যক্তি রয়েছে ব'লে Classless Society—এই শব্দটীকে চারণেরা তাদের আদর্শ বুঝাতে গিয়ে ব্যবহার করেছে। এ হ'চ্ছে এমন একটা জ্যোতির্ম্ময় আদর্শ যার জন্য সহস্র জীবন অনায়াসে বাঁচতে পারা যায়—যার জন্য সহস্র মরণও হাসিমুখে বরণ করা চলে। এই আদর্শের মধ্যে উড্ডীন রয়েছে প্রেমের জয়ধ্বজা। পৃথিবীর অগণিত শৃঙ্খলিত মানুষকে যারা মুক্ত করতে চেয়েছে দারিদ্র্য থেকে, অজ্ঞতা থেকে, নৈতিক অধঃপতন থেকে, যারা গড়তে চেয়েছে একটা নূতন পৃথিবী যার তোরণ-দ্বারে লেখা থাকবে 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—তারাই শুধু এই আদর্শের বেদীমূলে জীবনকে উৎসর্গ করবার প্রেরণা লাভ করেছে।

"There must be expropriation The well-being of all—the end, expropriation—the means" (Kropotkin)

আমরা বিশ্বাস করি শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শকে বাস্তবে সত্য ক'রে তুলতে হ'লে অপরিহার্য্য পন্থা হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ। স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে, নীতির দিক দিয়ে, জ্ঞানের দিক দিয়ে, সংস্কৃতির দিক দিয়ে প্রতিটী মানুষকে যদি আমরা উন্নত দেখতে চাই তবে আমাদের প্রথম কাজ হবে দারিদ্র্যকে প্রাচুর্য্যে রূপান্তরিত করা এবং সম্পদের সেই প্রাচুর্য্যের যাতে সবাই অধিকারী হয় তার জন্য যত্নবান হওয়া। ঠাকুর বলতেন, 'খালি পেটে কখনো ধর্ম্ম হয় না।' একথা খুব সত্য। উদরে

যেখানে ক্ষুধার আগুন সেখানে ভগবানের কথা কানে ঢোকে না। দারিদ্র্য আমাদের নৈতিক মেরুদণ্ডকে যে ভেঙে দেয়—এ বিষয়েও কি কোনো সন্দেহ আছে? আমাদের অজ্ঞতা, আমাদের দারিদ্র্য, আমাদের কুৎসিত পরিবেষ্টনীই আমাদিগকে দুর্নীতির পঙ্কে নিক্ষেপ করে। এই কথাটাকেই Dr Stockmannএর মুখ দিয়ে প্রকাশ করতে গিয়ে ইব্‌সেন লিখেছেন,

In a house which does not get aired and swept every day—my wife Katherine maintains that the floor ought to be scrubbed as well, but it is a debatable question—in such a house, people will lose within two or three years the power of thinking or acting morally. Lack of oxygen weakens the conscience"

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যেখানে দু'মুঠো অন্ন জোগাড় করতে গিয়ে প্রাণান্ত হ'তে হয় সেখানে বড়ো কিছু ভাববার মতো উদ্যম আর অবশিষ্ট থাকে না। সাহস এবং কল্পনাশক্তিকে আশ্রয় ক'রে সমাজ-ব্যবস্থাকে যদি আমরা এমন ভাবে গড়তে পারি যে কোন মানুষ খাওয়া-পরার ও থাকার অভাব অনুভব করবে না, তবেই মানুষের মন মুক্তি পাবে বড় বড় ভাবনা ভাবার জন্য।

সমাজনীতিই বল আর রাজনীতিই বল—অর্থনীতি হোলো উভয়ের গোড়ার কথা। আগে প্রত্যেকের খাওয়ার ব্যবস্থা করা চাই। মানুষের অন্নের সমস্যাকে অবহেলা ক'রে যা কিছু গড়তে যাবো কিছুই জোরালো হবে না—সবই হবে ঘুণ-ধরা। যে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক নিরন্ন সেখানে ধর্ম্ম বল, নীতি বল, সাহিত্য বল—কোন কিছুই খাঁটি হতে পারে না। সুতরাং মার্ক্সবাদীই হোক আর গান্ধীবাদীই হোক সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন—মানুষকে আগে অন্ন দিতে হবে—তারপরে অন্য কথা।

বাঁচলে তবে ধর্ম্মকর্ম্ম সব কিছু। জাহাজ যেখানে ডুবছে সেখানে আমরা জীবন-তরীব ব্যবস্থা করি, ঘবে যখন আগুন লাগে আমরা আগুন নেবানোর জন্য কম্বলের শরণ নিই, একটা জাতের শতকরা নব্বুই জন লোক যখন অনশনে জীবন কাটায় তখন তাদেব জন্য সর্ব্বাগ্রে কাজের এবং অন্নের ব্যবস্থা আমাদেব করতেই হবে। এর মধ্যে তর্কের কোনো স্থান নেই। কোটী কোটী ক্ষুধিত নরনারীর জন্য যতদিন আমরা অন্নের ব্যবস্থা না করতে পারছি ততদিন শ্রেণীহীন সমাজের স্বপ্ন স্বপ্ন হ'য়েই থাকবে। কমিউনিষ্ট, এ্যানার্কিষ্ট অথবা গান্ধীবাদীরা ডাল-ভাতের উপরে এতখানি জোব দিচ্ছে ব'লে একথা মনে করবাব কোনো কারণ নেই যে ডাল-ভাতেব বাইবে মানুষের আর কোনো প্রযোজনকে তারা স্বীকার করে না। তারা ভালো ক'রেই জানে যে খাওয়া-পরার আনন্দের বাইবে উচ্চতর আনন্দ আছে—বিজ্ঞানেব আনন্দ, আর্টের আনন্দ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আনন্দ, সুন্দরকে সৃষ্টি করার আনন্দ। এই উচ্চতর আনন্দেব অধিকারী এখন ভাগ্যবান মুষ্টিমেয় নরনারী—যদিও সবাইকে এই আনন্দেব অধিকারী করা একেবারেই অসম্ভব নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষকে উদরান্নের জন্য উদয়াস্ত এতই কঠোর পরিশ্রম করতে হয় যে আর্টের আনন্দকে, বিজ্ঞানের আনন্দকে উপভোগ করবার মতো তাদের সময়ও নেই, মনের শক্তিও নেই। কমিউনিষ্টরা অথবা গান্ধীবাদীরা প্রত্যেকটী মানুষকে অন্ন-চিন্তা থেকে মুক্ত করতে চান যাতে সে জীবনের উচ্চতর আনন্দগুলিকে উপভোগ করবার অধিকারী হতে পারে।

আর একটা কথা। ব্যক্তি-বিশেষের অথবা সংঘ-বিশেষের বদান্যতাকে আশ্রয় ক'রে দয়া দিয়ে আমরা দিগন্তব্যাপী এই দুঃখের অবসান ঘটাতে পারবো না। এর জন্য চাই বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল

পরিবর্ত্তন। হাজার হাজার মানুষের নিজের বল্‌তে এক ছটাকও জমি নেই। অথচ এক একজন মানুষ রয়েছে যারা একাই হাজার হাজার বিঘা জমির মালিক। লক্ষ লক্ষ মানুষের দারিদ্র্য যে এমন দুঃসহ তার কারণ নিজের বল্‌তে একটুও জমি নেই তাদের। দেশব্যাপী দৈন্যের বিভীষিকা দূর করতে হ'লে এমন ব্যবস্থা করা চাই যাতে ভদ্রভাবে বাঁচতে গেলে যত-টুকু জমির দরকার হয় তার চেয়ে বেশী জমির অধিকারী কেউ না হ'তে পারে। সম্পত্তির উপরে ব্যক্তিবিশেষের অবাধ অধিকার যতদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে ততদিন কোটী কোটী মানুষ দরিদ্রই থেকে যাবে। এই জন্য মার্ক্সবাদী এবং গান্ধীবাদী উভয়েই জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের এত পক্ষপাতী। কিছুকাল আগে শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ রামগড় কংগ্রেসে উপস্থিত করবার জন্য গান্ধীজীর কাছে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি পেশ করেন,

"The land laws of the country shall be drastically reformed on the principle that land shall belong to the actual cultivator alone, and that no cultivator should have more land than is necessary to support his family on a fair standard of living"

"দেশের ভূমিসংক্রান্ত আইনের এমন ভাবে সংস্কার করতে হবে যে জমির মালিক হবে শুধু চাষী এবং স্বচ্ছন্দে পরিবার প্রতিপালনের জন্য যতটা জমির দরকার তার বেশী জমি কেউ পাবে না।"

জয়প্রকাশের এই প্রস্তাবের উপরে মন্তব্য ক'রে গান্ধীজী লিখেছেন,

'Sri Joyprokasha's propositions about land may appear frightful In reality they are not. No man should have more land than he needs for dignified sustenance Who can dispute the fact that the grinding poverty of the masses is due to their having no land that they can call their own?"

(Harijan 20·4 40)

"শ্রীজয়প্রকাশের ভূমিসংক্রান্ত প্রস্তাব ভীতিপ্রদ মনে হ'তে পারে। আসলে কিন্তু ভয় পাবার কিছু নেই। মানুষের গরিমা নিয়ে বাঁচবার জন্য যতখানি জমি থাকা প্রয়োজন তার বেশী কারও জমি থাকা উচিত নয়। জনসাধারণের প্রাণান্তকর দারিদ্র্যের কারণই হচ্ছে তাদের আপনার বলতে ভুঁই এতটুকুও নেই। এই অবিসম্বাদী সত্যকে অস্বীকার করবে কে ?"

(হরিজন ২০ ৪ ৪০)

গান্ধীজী The World of To-morrow নামক প্রবন্ধেও এই কথাই লিখেছেন। সেখানে আছে :

"Equal distribution the second great law of the world of to morrow as I believe it will be—grows out of non-violence The real implication of equal distribution is not an arbitrary dividing up of the goods of the world. It is that each man shall have the wherewithal to supply his natural needs and no more"

"ভাবী জগতের দ্বিতীয় মহাদর্শ হবে—সম্পদকে সকলের মধ্যে সমভাবে বণ্টন ক'রে দেওয়া। এই ব্যবস্থা নন্‌ভায়োলেন্সের মূলনীতি থেকেই উদ্ভূত হবে। সম্পদকে সকলের মধ্যে সমান ভাব বেঁটে দেওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই নয় যে পৃথিবীর ধনরাশিকে সকলের মধ্যে যেমন-তেমন ক'রে ভাগ ক'রে দিতে হবে। আসল ব্যাপার হচ্ছে, মানুষ হ'যে বেঁচে থাকবার জন্য যা-কিছু প্রয়োজন—প্রত্যেক মানুষ তা পাবেই—তার বেশী কিন্তু পাবে না।"

সম্পত্তি-ভোগের ব্যাপারে ব্যক্তির অধিকারের যে একটা সীমা থাকা উচিত—এই কথাই গান্ধীজী স্পষ্ট ক'রে বল্‌লেন। সামাজিক সম্পদের উপরে ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতাকে স্বীকার ক'রে নিলে ধনবৈষম্য অনিবার্য্য। একদল লোক ধনবৈষম্যের সুযোগ নিয়ে আর একদল লোককে শোষণ করবে আর শোষণ হিংসা ছাড়া আর কিছু নয়। যে সমাজে একদল লোক দুধ-সর সবই ভোগ করছে এবং অপর একদল চাঁচি পর্য্যন্ত পাচ্ছে না সে সমাজের ভিত্তি প্রেমে নয়—লোভে। যেখানে

প্রেম সেখানে আছে মনুষ্যমাত্রকেই আত্মবৎ দেখার উদারতা। সেখানে একদল মানুষ সব-কিছুই ভোগ করবে এবং আর একদল মানুষ সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকবে—এমন ঘটতেই পারে না। এইজন্যই গান্ধীজী তাঁর গঠনমূলক কার্য্য-তালিকার মধ্যে যেখানে Working for Economic Equalityর কথা আছে সেখানে বলছেন, সম্পদের উপরে সকলের সমান অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সাধনাই হচ্ছে the master key to non-violent Independence. পুনরায় বলছেন,

"A non-violent system of Government is clearly an impossibility so long as the wide gulf between the rich and the hungry millions persists."

'যতকাল পর্য্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত জনসাধারণ এবং মুষ্টিমেয় ধনকুবের—এই উভয়ের মধ্যে ধনগত বৈষম্যের ব্যবধান জাগ্রত হ'য়ে থাকবে ততদিন পর্য্যন্ত অহিংসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থা অসম্ভব।"

তারপরেই বলছেন :

"The contrast between the palaces of New Delhi and the miserable hovels of the poor labouring class can not last one day in a free India in which the poor will enjoy the same power as the richest in the land."

"নয়াদিল্লীর প্রাসাদগুলির আর সর্ব্বহারা শ্রমিকদের কদর্য্য বাসস্থানের মধ্যে যে বৈষম্য—স্বাধীন ভারতবর্ষ এই বৈষম্যকে একদিনের জন্যও বরদাস্ত করবে না। স্বাধীনভারতে দেশের সব চেয়ে ধনী ব্যক্তি যে ক্ষমতা ভোগ করবে—গরীবও সেই অধিকারই ভোগ করবে।"

ষোল আনা অহিংসাবাদী হ'তে গেলে কোন ক্ষেত্রেই শোষণকে বরদাস্ত করা চলবে না। যে সমাজে ধনবৈষম্যের আধিপত্য তাকে স্বীকার

ক'রে নিলে হিংসাকেই স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়। যিনি সত্যিকারের অহিংসবাদী তিনি এমন একটা জগতকে সৃষ্টি করার জন্য সংগ্রাম করবেন যেখানে প্রত্যেকটী মানুষের জীবনই মুক্ত, শুদ্ধ, পূর্ণ। যে জগতে শোষণ নেই সেখানেই শুধু মানুষের এই জ্যোতির্ম্ময় আত্মপ্রকাশ সম্ভব।

সম্পত্তির উপরে ব্যক্তির অবাধ অধিকারকে একবার স্বীকার ক'রে নিলে সর্ব্বহারারা কোনো দিনই দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে না। সুতরাং আমরা চারণেরা বিশ্বাস করি যে কোটী কোটী নিরন্ন মানুষের জন্য অন্নের ব্যবস্থা করতে গেলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ অনিবার্য্য। কিন্তু বংশ-পরম্পরায় মানুষ জমির উপরে, খনির উপরে, কলকারখানার উপরে যে অধিকার ভোগ ক'রে এসেছে—হঠাৎ সে অধিকার সে ত্যাগ করবে কেন? নিজের স্বার্থ মানুষ সহজে ত্যাগ করতে চায় না। বাপ-ঠাকুরদা জমিদারী ক'রে গেছেন—সেই জমির খাজনায় বিনা পরিশ্রমে দিন চলে যাচ্ছে নিরুদ্বেগে। হঠাৎ তার উপরে অধিকার ছেড়ে দিলে ব'সে ব'সে খাওয়ার সৌভাগ্য চিরতরে চ'লে যাবে। সেই সৌভাগ্য কি কেউ ইচ্ছা ক'রে ত্যাগ করতে চায়? সাম্যের আদর্শকে ধনীরা যদি স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিতো তা হ'লে ইতিহাসে রক্তের গঙ্গা বইয়ে বিপ্লব বারে বারে ঘটতে পারতো না। নিরন্নের দল যতদিন পারে দারিদ্র্যের দুর্ভাগ্যকে নীরবে বহন ক'রে চলে। সে দুর্ভাগ্য যখন দুঃসহ হ'য়ে ওঠে ধৈর্য্যের বাঁধ তখনই যায় ভেঙে। দিকে দিকে তখন রক্তকেতন উড়িয়ে দিয়ে বিপ্লব আসে অন্যায়ের অবসান ঘটাতে—ন্যায়ের শাসনকে প্রতিষ্ঠিত করতে। মানব-চরিত্রের সনাতন দুর্ব্বলতা সম্পর্কে আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে তার থেকে এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হ'তে পারি যে ধনীরা স্বেচ্ছায় তাদের স্বার্থকে পরিত্যাগ করবে না। জমি,

খনি, কলকারখানাকে রাষ্ট্রের সাহায্যে ছিনিয়ে নিতে হবে তাদের অধিকার থেকে। এই ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটাকে কমিউনিষ্ট এবং এ্যানার্কিষ্ট-দের ভাষায় expropriation বলা হ'য়ে থাকে। আমরা চাবণেরা শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শে পৌছানোর জন্য expropriationকে অপরিহার্য্য পন্থা ব'লে বিশ্বাস ক'রে থাকি।

কিন্তু expropriationএর ব্যাপারটা একেবারেই সোজা নয়। রাষ্ট্র ব'লে একটা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হচ্ছে লক্ষ্মীর বরপুত্রের দল। টাকা বিলিয়ে দেবার জন্য তারা তো বিষয় করেনি। বিষয় তাদের রক্ষা করতে হবে। চারিদিকে সহস্র সহস্র বুভুক্ষু মানুষ যাদের ক্ষুধাতুর পুত্রকন্যা এবং দক্ষিণবাহু ছাড়া আপনার বলতে আর কিছু নেই। এরা যদি ক্ষুধার তাড়নায় ক্ষেপে গিয়ে জমি-খনি-কল-কারখানা সব অধিকার ক'রে বসে তবে তো সর্ব্বনাশ। সিগার ফুঁকে, শ্যাম্পেন খেয়ে, মোটর চ'ড়ে ঘুরে বেড়াবার দিন এক নিমেষে ফুরিয়ে যাবে। অতএব সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন বিষয়-রক্ষার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা। সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে গিয়ে ধনীরা রাষ্ট্রকে খাড়া করেছে আর এই রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটীর বৈশিষ্ট্য যে কোথায় তা আমরা ভালো ক'রেই জানি। সেই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মৃত্যুর শাসনকে অবিচলিত রাখবার জন্য তার দমন করবার ক্ষমতায়। ধনীরা যে-সমাজ-ব্যবস্থাকে কায়েম রাখতে চায় পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে ব'সে ব'সে খাবার জন্য—তার নড়-চড় করতে গেলেই রাষ্ট্রের মুদ্গর সঙ্গে সঙ্গে মাথায় পড়বে। বস্তুতঃ ধনীদের বিষয় রক্ষার জন্য মুদ্গর চালানোই

হ'চ্ছে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। রাষ্ট্রের হাতে রয়েছে মারাত্মক অস্ত্র—রেগুলেশন লাঠি থেকে আরম্ভ ক'রে এরোপ্লেন পর্য্যন্ত। একটু ট্যাঁফু করতে গেলেই রাষ্ট্র যে কী চিজ্ তা ধনীরা হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেবে। সর্ব্বহারারা যতক্ষণ ধনীদের বিষদাঁত রাষ্ট্রকে ওপ্‌ড়াতে না পারছে ততক্ষণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ অসম্ভব। তারা দারিদ্র্যের যে তিমিরে আছে সেই তিমিরেই থেকে যাবে এবং ধনীরা ঐশ্বর্য্যের যে শিখরে বসবাস করছে সেই শিখরেই পুরুষানুক্রমে বসবাস করতে থাকবে। অতএব জমি, খনি এবং কলকারখানার উপরে মুষ্টিমেয় মানুষের যে অবাধ অধিকার রয়েছে তার অবসান ঘটাতে হ'লে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্ত্তন চাই সর্ব্বপ্রথমে।' রাষ্ট্রশক্তিকে জয় করবার আগেই যারা অর্থনৈতিক গণতন্ত্র নিয়ে বড্ড বেশী হৈ চৈ করে তারা রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতির কি নিগূঢ় সম্পর্ক তা ভালো ক'রে জানে না। রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে উপেক্ষা ক'রে যারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর অত্যন্ত বেশী জোর দেয় তারা গাড়ীকে রাখে ঘোড়ার আগে। আমাদের বামপন্থী সোস্যালিষ্ট বন্ধুরা এ বিষয়ে যদি একটু সচেতন হন। যা আগের কাজ তা আমাদের আগেই করতে হবে, যা পরের কাজ তা পরে। আগে চাই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা—পরে আসবে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিন।

কিন্তু সর্ব্বহারারা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাবে কেমন ক'রে? রাষ্ট্রের হাতে রয়েছে প্রচণ্ড প্রচণ্ড হাতিয়ার। তাদের তো কোন হাতিয়ার নেই—যা আছে তা দিয়ে দমদম বুলেটের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যাবে

না। এরোপ্লেন থেকে লক্ষ্যস্থানে বোমা ফেলতে হ'লে অনেক দিনের শিক্ষা চাই। সে শিক্ষাই বা তাদের কোথায আব সেই হাতিযারই বা তাদের কোথায ? হাতিয়ারকে সহায ক'বে আধুনিক রাষ্ট্রেব উচ্ছেদ ঘটানো এক রকম অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। জার্ম্মাণীতে এবং ইটালিতে কমিউনিষ্টরা পারলে না হিটলারের আর মুসোলিনীর শক্তিকে পর্য্যুদস্ত করতে। গোটাকতক রিভলবার দিযে তো আর হাজার হাজার ট্যাঙ্ক এবং এরোপ্লেনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া চলে না। এর উপরে রয়েছে গুপ্তচরের অভিশাপ—টেলিফোন, বেতারযন্ত্র, দ্রুতগামী মোটরকার ইত্যাদি নিযে এরা রাষ্ট্রের শত শত বিনিদ্র চক্ষুর মতো জেগে আছে। তাদের শ্যেন-দৃষ্টিকে এড়িযে গোপনে গোপনে বিপ্লবসৃষ্টির আয়োজন করা কঠিন ব্যাপার। এজন্য সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উচ্ছেদ ঘটানোর আশা ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মন্দিরে পৌছানোর অন্য রাস্তা আমাদের অবলম্বন করতে হবে। ভোটের জোরে পার্লামেণ্ট দখল ক'রে আইনের সাহায্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্রমশঃ উচ্ছেদ সাধনের পরামর্শ কেউ কেউ দেন বটে—কিন্তু আমরা জানি সে পথে আমরা গন্তব্যস্থানে পৌছাতে পারবো না। আবেদন-নিবেদনের পথের কথা তো উঠতেই পারে না। কাঁসার টাকার মতো তা একে-বারেই অব্যবহার্য্য। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তন সাধনের কেবল একটা পথই খোলা আছে আর সে পথ হচ্ছে সত্যাগ্রহের ভীষণ-সুন্দর পথ। আমরা প্রাণের ভয়ে, সম্পত্তি হারানোর ভযে শক্তির ঔদ্ধত্যকে প্রতিদিন স্বীকার ক'রে চলি। যদি হাজার হাজার লোক সেই ঔদ্ধত্যকে স্বীকার ক'রে নিতে সম্মত না হয় তা হ'লে অন্যাযের শাসন ধূলিসাৎ হ'য়ে যায। অত্যাচারীর শাসন-দণ্ডকে স্বীকার ক'রে না নিলে ক্ষতি অনিবার্য্য—প্রাণের দিক দিয়ে এবং বিষয়ের দিক দিযে—দু'দিক দিযেই ক্ষতির

সম্ভাবনা। সেই ক্ষতিকে স্বীকার ক'রে নিতে গেলে বুকে চাই অপর্য্যাপ্ত সাহস। যেখানে হাজার হাজার মানুষ এই সাহসের অধিকারী হয়েছে সেখানে অন্যায় টি'কতে পারে না, অত্যাচারীর সমস্ত শক্তি পঙ্গু হ'য়ে যায়। এইজন্যই গান্ধী বলেছেন—

"Cowardice should have no place in the national dictionary"
"জাতীয় জীবনের অভিধানে ভীরুতা ব'লে কোনো শব্দ থাকবে না।"

দেশে ভীরুতা থাকতে স্বাধীনতার সূর্য্যোদয় অসম্ভব। বীর হ'তে হবে—সত্য ব'লে যা বিশ্বাস করি জীবনে তার জয়ধ্বজাকে উড্ডীন রাখবার জন্য সর্ব্বদুঃখকে বরণ করতে হবে, গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের মধ্যে এই বীর্য্যের কঠিন মন্ত্র। তিনি আমাদের হাতে দিয়েছেন মৃত্যুর অস্ত্র। এ অস্ত্রকে যে দেশ ব্যবহার করতে শিখেছে সে দেশে অত্যাচার একদিনের জন্যও টি'কতে পারে না। চাবণেরা এই civil disobedienceকে স্বাধীনতা অর্জ্জনের ব্রহ্মাস্ত্র ব'লে বিশ্বাস করে। ও দেশের অল্‌ডাস্ হাক্সলির কণ্ঠেও এই civil disobedienceএর জয়গান।

"The only methods by which a people can protect itself against the tyranny of rulers possessing a modern police force are the non-violent methods of massive non-co-operation and civil disobedience" (Ends and Means P 155)

"আধুনিক পুলিশবাহিনীর দ্বারা সুরক্ষিত শাসকদের নির্য্যাতন থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র পন্থা হচ্ছে জনসাধারণের পক্ষ থেকে অহিংসার পথে অসহযোগের এবং আইন-অমান্যের বিপুল আয়োজন।'

দু'একজন অথবা দু'দশ জনের civil disobedience দেশে

একটা নৈতিক সাড়া জাগালেও স্বাধীনতা পেতে গেলে হাজার হাজার মানুষকে বীর্য্যের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে হবে। কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যের ভিতর দিয়ে গান্ধীজী জনসাধারণের হৃদয়ে দেশের জন্য আত্মদানের উন্মাদনা জাগাতে চান। চরকার পিছনে যদি বীরের প্রাণ না থাকে—তার দ্বারা আমরা একটুও লাভবান হবোনা—এই কথাই গান্ধীজীর কথা। মরণ-ভীরু ক্লীবের হাতে চরকা মকদ্দমাবাজ বিষয়ীর হাতে জপের মালার মতোই বিসদৃশ। গান্ধীজীর সব চেয়ে বিতৃষ্ণা ভীরুতার উপরে, দুর্ব্বলতার উপরে। চরকা যদি দেশ থেকে এই দুর্ব্বলতা দূর না করতে পারে গান্ধীজীর কাছে তার প্রয়োজন নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। যার পিছনে বীর্য্য নেই তার মূল্য কি ?

"We do not fight violence so much as weakness Nothing is worth while unless it is strong, neither good nor evil"—Rolland

"আমাদের লড়াই হিংসার বিরুদ্ধে ততখানি নয় যতখানি দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে। যার মধ্যে শক্তি নেই—তা ভালোই হোক আর মন্দই হোক—আমাদের কাছে তার কোনো মূল্য নেই।' (রলাঁ—গান্ধীর জীবন-চরিত)

সুতরাং সারা জাতকে সাহসী ক'রে তোলাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড়ো কাজ। ক্লীবের জাতকে বীরের জাতে রূপান্তরিত করবার সাধনাই হচ্ছে গান্ধীজীর সাধনা। এজন্য আমাদের সংঘবদ্ধ করতে হবে দেশের হাজার হাজার মজুর আর কৃষককে। তারাই জাতির মেরুদণ্ড। তারা যেখানে বীর্য্যের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছে সেখানে পরাধীনতার অস্তিত্ব অসম্ভব।

আদর্শ যতই কল্যাণময় হোক কেবল নিজের জোরে কখনো তা জয়ী হ'তে পারেনা। চারণের আদর্শও কেবল মহৎ ব'লেই যেন জয়ের আশা না করে। বন্দে মাতরমের মতো এমন একটা অদ্বিতীয় সঙ্গীত অনেক-দিন ধ'রে আনন্দ মঠের পাতায় মৃত হ'য়ে ছিলো যাদুঘরের মমিদের মতো। সেই সঙ্গীত প্রাণ পেলো স্বদেশী আন্দোলনের দিনে কর্ম্মবীরদের প্রাণের অগ্নিশিখা থেকে। দাবানলের মতো সেই গানের আগুন অগণিত হৃদয়ে ছড়িয়ে গেল। শ্রেণীহীন সমাজের বিরাট আদর্শকে সত্য ক'রে তুলতে হ'লে তাকে জনসাধারণের জীবনের অঙ্গীভূত ক'রে তুলতে হবে। জনসাধারণ সেই আদর্শকে অন্তরে যখন নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করবে তখনই তা'র জয়যাত্রা হবে সুরু। আদর্শ বাস্তবে সত্য হ'য়ে উঠবার জন্য তাই কর্ম্মশক্তির অপেক্ষা করছে। নীরব সেবার মধ্য দিয়ে জন-সাধারণের মনকে শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবার উপায় গান্ধীজীর গঠনমূলক কার্য্যতালিকার অনুসরণ। আমরা চারণেরা সেই কর্ম্মতালিকায় বিশ্বাস করি।

আমরা জাতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাস করি। প্রত্যেক জাতিরই সংস্কৃতিগত একটা বিশিষ্টতা আছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও ইহা সত্য। ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আত্মীয়তার সাধনার উপলব্ধিতে,সত্যকে অকুতোভয়ে অনুসরণ করার দৃঢ়তায়, আড়ম্বরহীন সংযত জীবনের নির্ম্মলতায়। জাতীয় সংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার ক'রে আমরা যদি জোর করে কোনো ধার-করা আদর্শকে দেশের উপরে চাপাতে যাই ব্যর্থকাম হবো নিশ্চয়ই। জনসাধারণের মনকে আমরা স্পর্শ করতে পারবোনা। আমরা গান্ধীজীর জীবনে এবং বাণীতে ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির গরিমাময় বৈশিষ্ট্যকে দেখতে পেয়েছি। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে

নত হবার বাণী যাঁর কণ্ঠে তিনি পেট্রিয়টিজ্‌মের দাবীকে কিন্তু অস্বীকার করেন নি। ইংরেজী ভাষাকে এবং ইংরেজ জাতিকে তিনি ভালোবাসেন কিন্তু সেই ভালোবাসা জ্ঞানে দীপ্ত এবং বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। তিনি ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন হবার মর্য্যাদা দিতে একেবারেই রাজী নন। সে মর্য্যাদার অধিকারী শুধু আমাদের মাতৃভাষা। ইংরেজের কল্যাণ তিনি মনে প্রাণে কামনা করেন কিন্তু ভারতবর্ষের কল্যাণের দাবী সর্ব্বাগ্রে। খাদিশিল্পকে গড়তে গিয়ে যদি ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ে অগ্নিসংযোগ করতে হয় তাতে গান্ধী পশ্চাতপদ নন। আমরা গান্ধীজীর মতোই দেশপ্রীতির এবং সার্ব্বলৌকিক প্রীতির কল্যাণময় সমন্বয়ে বিশ্বাস করি। মস্কো মানবসভ্যতাকে যা দান করেছে তার সম্পর্কে আমরা উদাসীন নই কিন্তু সেখান থেকে যা-কিছু আসবে তাকে নির্ব্বিচারে বেদবাক্য ব'লে মেনে নেওয়াকে গোঁড়ামি ব'লেই মনে ক'রে থাকি। দেশপ্রীতি এবং সার্ব্বলৌকিক প্রীতির একটাকে বেছে নিতে হবে—এ হচ্ছে গোঁড়ামির কথা। আমাদের দেশপ্রেম জ্ঞানে দীপ্ত হবে না গোঁড়ামিতে সঙ্কীর্ণ হবে—এইটাই হচ্ছে ভাববার কথা।

কুটিরশিল্প এবং যন্ত্রশিল্প—এ দুটোর একটাকে বেছে নিতে হবে এমন কথাকেও আমরা গোঁড়ামি ব'লে মনে করি। আমরা বিশ্বাস করি উভয়ের সমন্বয়ে। কুটিরশিল্পেরও প্রয়োজন আছে—যন্ত্রশিল্পেরও প্রয়োজন আছে। কারও প্রয়োজন অন্তহীন নয়। মুস্কিল হয় তখনই যখন আমরা একটা দিক লক্ষ্য ক'রে অনবরত সেইদিকে চলতে থাকি, একটা জায়গায় এসে থামা উচিত, একথা ভুলে যাই। থিয়োরীর ব্রহ্মদৈত্য ঘাড়ে চাপ্‌লে এমনই হয়। আমাদের সাধারণ-বুদ্ধি ঘুলিয়ে যায়—কাকে কতখানি মূল্য দেওয়া উচিত সে-বোধ আর থাকে না। যন্ত্রশিল্পের সমর্থকেরা

যখন কুটিরশিল্পকে হেসে উড়িয়ে দিতে যায় তখন বুদ্ধির দৈন্যকেই প্রকাশ করে। যন্ত্রশিল্পের প্রয়োজন আছে কিন্তু সে প্রয়োজনের সীমাও আছে যেমন সব কিছুরই প্রয়োজনের সীমা আছে। কাঠের চেয়ার হয়, টেবিল হয়, হরেক রকমের আসবাবপত্র হয় কিন্তু তাই ব'লে কাঠের ছুরি হয় না, টুপি হয় না, ক্ষুর হয় না। কুটির-শিল্পেরও প্রয়োজন আছে কিন্তু সে প্রয়োজনও তো অসীম নয়। কুটিরে কাপড় হয়, কাগজ হয়, জুতা হয় কিন্তু জাহাজ হয় না। নৌশিল্পের উন্নতির জন্য যন্ত্রের শরণাপন্ন হ'তেই হবে।

যে কারণে আন্তর্জাতিকতার গোঁড়ামি এবং যন্ত্রশিল্পের গোঁড়ামি বাঞ্ছনীয় নয়—সেই কারণেই বিজ্ঞানের গোঁড়ামিও বাঞ্ছনীয় নয়। বিজ্ঞানের প্রয়োজন যে অত্যন্ত বিপুল এতে কোনো সন্দেহ নেই। দারিদ্র্য ঘোচাতে হ'লে সম্পদের প্রাচুর্য্য চাই আর সম্পদের প্রাচুর্য্যের জন্য বিজ্ঞানের শরণ নিতে হবে। কিন্তু যখন আমরা বলি—যাকে আমরা মাপতে পারি, গুণতে পারি, ওজন করতে পারি তাই শুধু সত্য—আর কোন-কিছুর মূল্য নেই তখন বিজ্ঞানের সঙ্গে সত্যের বিরোধ ঘটে। আর্ট, ধর্ম্ম, সৌন্দর্য্য, প্রেম—এরা জীবনকে ধন্য করে কিন্তু এদের মূল্য তো দাড়িপাল্লায় নিরূপণ করা যায় না। কোনো দ্রব্যের কঠিনত্বকে আমরা উপলব্ধি করি স্পর্শের দ্বারা। ছোঁয়ামাত্রই জিনিষটা যে শক্ত—তা আমরা বুঝতে পারি। সৌন্দর্য্যের যে উপলব্ধি—কঠিনত্বের উপলব্ধির মতোই তা সত্য। দুটোই মন দিয়ে অনুভব করবার ব্যাপার, যুক্তিতর্ক দিয়ে মগজের সাহায্যে প্রমাণ করবার ব্যাপার নয়। পদার্থের কঠিনত্বকে সত্য বলবো কিন্তু সৌন্দর্য্যের অনুভূতিকে মায়া ব'লে উড়িয়ে দেবো—এ হ'চ্ছে নিছক গোঁড়ামি। নাস্তিক্যবাদকে আমরা এই কারণেই গোঁড়ামি

ব'লে মনে ক'রে থাকি। যুক্তিতর্ক দিয়ে লোকের আস্তিক্য-বুদ্ধিকে জোর ক'রে জাগ্রত করবার চেষ্টাও আর এক রকমের গোঁড়ামি। ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে আমরা কোনো তর্ক করিনে। ওটা তর্কের ব্যাপারই নয়।

নীডারশীপে আমরা বিশ্বাস করি। নেতার মতো নেতা ছাড়া কোনো আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হ'তে পারে না। প্রতিভাশালী নেতার আবির্ভাব জাতি গঠনের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান। এইজন্য গান্ধীজীর নেতৃত্বকে আমরা কখনো আঘাত করিনে। সেই নেতৃত্বের উপরে আমরা জনসাধারণের বিশ্বাসকে দিনে দিনে দৃঢ়তর ক'রে তুলতে চাই। নেতার কাজ পরিচালিত করা, জনসাধারণের কাজ পরিচালিত হওয়া। নেতা যেখানে দৃঢ়তার অভাবে কর্ণধারের কাজ করতে ভুলে যায় এবং জনসাধারণ যেখানে গণতন্ত্রের এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে নেতার অনুসরণ করতে অস্বীকার করে সেখানে সংগ্রামে সাফল্য অসম্ভব। মানুষের ইতিহাসে যা কিছু গৌরবময় তা মুষ্টিমেয় মানুষেরই দান। মুষ্টিমেয় মানুষেই ইতিহাসকে গ'ড়ে তুলেছে। কিন্তু তাই ব'লে ইতিহাসে যারা অখ্যাতনামা তাদের মূল্যকে আমরা ছোট করতে চাইনে। দেশে দেশে এই অখ্যাতনামা জনসাধারণের শৌর্য্যকে আশ্রয় ক'রে বিপ্লব হয়েছে বারে বারে জয়যুক্ত। গান্ধীজীর যে গঠনমূলক কার্য্যের তালিকা তার একটা প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সেবার পথে শিক্ষার দ্বারা জনসাধারণের চিত্তকে বিপ্লবমুখী ক'রে তোলা। যেখানে জনগণের চিত্তকে আমরা বিপ্লবী ক'রে তুলতে পারিনি, আনতে পারিনি তাদের মনে নির্ভীকতা এবং আত্মশক্তিতে সুদৃঢ় বিশ্বাস সেখানে আমাদের গঠনমূলক কর্ম্মের সাধনা ব্যর্থ হয়েছে।

আমরা বিশ্বাস করি বিশ্বব্যাপী গণজাগরণের ফলে ধনকুবেরদের আধিপত্যের কাল অবসানপ্রায়। সম্মুখে নূতন-যুগ-সূর্য্যের উদয়কাল আসন্ন। সেই নূতন যুগে পৃথিবীকে শাসন করবে—আজ যারা শৃঙ্খলিত সর্ব্বহারা। এই বিশ্বাসই গান্ধীজির বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসকে ব্যক্ত করতে গিয়ে গান্ধী লিখেছেন,

But I have visions that the end of this war will mean also the end of the rule of Capital I see coming the day of the rule of the poor, whether through force of arms or of non-violence.

আমি কল্পনার চোখে দেখতে পাই—এই লড়ায়ের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ধনকুবেরদের আধিপত্যের অবসান ঘটবে। আমি দেখতে পাচ্ছি—সর্ব্বহারাদের আধিপত্যের দিন আগতপ্রায়। সেই আধিপত্য সশস্ত্র বিপ্লবের পথে আসতে পারে—অহিংসার পথেও আসতে পারে।

আর-একটা কথা এবং শেষ কথা। কারও কারও ধারণা—গান্ধীজী জীবনযাত্রার সরলতার উপরে অত্যন্ত জোর দিতে গিয়ে আমাদের বর্ব্বরতার স্তরে নামিয়ে আনতে চান। এই ধারণা ভুল। গান্ধীজীর স্বরাজের পরিকল্পনায় উপকরণের বাহুল্যে জীবন ভারাক্রান্ত নয় বটে কিন্তু সম্পদের প্রাচুর্য্যে প্রতিটী গৃহ সেখানে দীপ্তিমান। সেখানে জীবন দীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত। তিনি লিখছেন ;

According to my definition of Swaraj even the poorest Indian should get enough milk, ghee, vegetable and fruits Every man and woman must get a balanced diet and a decent house

আমার পরিকল্পিত স্বরাজে দীনতম ভারতবাসীও খেতে পাবে প্রচুর দুধ আর ঘি, শাকসব্জী ও ফলফুলুরি। প্রত্যেক নর ও নারী ভালো বাড়ীতে বাস করবে—শরীর ধারণের উপযোগী স্বাস্থ্যসম্মত আহার্য্যও পাবে।

———

লেখকের অন্যান্য পুস্তক

	-বহাবাদেব গান (৩য় সংস্কবণ)	৷৷০
।	বদ্রোহীব স্বপ্ন (২য় সংস্কবণ)	৸০
৩	।াম্যবাদেব গোডাব কথা (২য় সংস্কবণ)	১।০
৪ ।	ৎমিউনিজম্	৸০
৫ ।	মানুষেব অধিকাব (২য় সংস্কবণ)	।০
৬ ।	সভ্যতাব ব্যাধি	৵১০
।	বিষলিষ্ট ববীন্দ্রনাথ	১৲
৮ ।	নেব গভীবে	১৲
৯ ।	ক্তিপাগল বঙ্কিমচন্দ্র	১৲
১০ ।	অগ্রদূত	১৲
১১ ।	বীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লী-চিত্র	৸০
১২ ।	স্বর্গেব ঠিকানা	৸০
১৩ ।	সাম্যবাদেব মর্ম্মকথা	৷৷০
১৪ ।	ক-জয়ের সেনা	৷৷০
১৫ ।	বেব মায়া	৷৵০
১৬ ।	সেনাপতি গান্ধী	৷৵০
১৭ ।	রাসিযার কথা	।০

১৮। অভিশাপ না আশীর্ব্বাদ ৵০

১৯। ত্রয়ী (২য় সংস্করণ) ।৹

২০। বঙ্কিমের স্বপ্ন ৶০

২১। দ্রষ্টার চোখে ৶০

২২। ঝটিকার ঊর্দ্ধে ৶০

২৩। মনের খেলা ১৲

২৪। হ্যাভেলক এলিস ও যৌনবিজ্ঞান ৸০